দেবী চৌধুরাণী কল্পিতা নন

- গৌতম কুমার দাস

দেবী চৌধুরাণী বাঙালীর ঘরে ঘরে এক পরিচিত নাম। এককথায়, বাঙালী মাত্রেই দেবী চৌধুরাণীকে চেনে। তার কারণ অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঋষি বঙ্কিম তাঁর অসাধারণ লেখনীর জাদু স্পর্শের সম্মোহিত কথার খেলায় 'দেবী চৌধুরাণী' চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণী ও তার কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনা আশ্রিত হলেও আসল দেবী চৌধুরাণী কল্পিতা চরিত্র নন। বাস্তবের মাটির পৃথিবীতে তাঁর আনাগোনা, সমাজ ও সংসার। দেবী চৌধুরাণী তাঁর উপাধি। উপাধি বুঝিয়ে দেয় তিনি এক জমিদার। জমিদার ছাড়াও তিনি এক অসামান্য নেত্রী। সন্ন্যাসী - ফকির বিদ্রোহের তথা কৃষক - বিদ্রোহের নেত্রী। তাঁর আসল নাম জয়দুর্গা। জয়দুর্গা রংপুরের কাউনিয়া থানার শিব কণ্ঠিরাম গাঁয়ের কুরশা বামন পাড়ার মেয়ে। তাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়চৌধুরি, পিতার উপাধি দেখে মনে হয় দেবীর পিতাও জমিদার ছিলেন। কাউনিয়া একটি ছোট্ট শহর। এখন সেখানে রেল স্টেশন। পাশে তিস্তা। যে নদী জয়দুর্গা রায়চৌধুরির বালিকা বেলার নিত্য সহচরী। তিস্তার সঙ্গে তাই তাঁর আজীবন সখ্যতা। জীবনে চলার পথে কিছু সময়ের আশ্রয়স্থলও বটে। যখন তাঁর সময় কাটে নৌকায়, বজরায়। কিশোরী জয়দুর্গার সঙ্গে মন্থনার (বর্তমান পীরগাছা) যুবক জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরির বিয়ে হয়ে যায়। তখন থেকেই জয়দুর্গা রায়চৌধুরি দেবী চৌধুরাণী। কিশোরী জয়দুর্গা যুবতী হতে না হতেই জীবনের ছন্দপতন। হঠাৎই জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরির অকাল-মৃত্যু। বছর টা ১৭৬৫। জয়দুর্গার জীবন-নদীও বাঁক নেয় অন্য পথে। ১৭৬৫ খ্রিঃ থেকেই মন্থনার জমিদারি সামলানো তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে উত্তর বাংলা এক দক্ষ জমিদার পায়। প্রায় তিন দশক ধরে। তাঁর জমিদারির সময় কাল ১৭৬৫ থেকে ১৭৯১ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রজারা তাদের এই সুন্দরী যুবতী জমিদারকে ভগবতী তুল্য মনে করে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পরামর্শ নেয়। যদিও তাঁর জমিদারির সময়টা খুব একটা ভালো কাটে নি। তাঁকে একে একে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ ইত্যাদি। নাড়ির টানে তিনি শুধু এই বিদ্রোহগুলিকে সমর্থন জানিয়ে ক্ষান্ত হন নি, নেতৃত্ব দানও করেছিলেন। প্রজাদের স্বার্থে দেবী আজীবন লড়াই চালিয়েছেন। তার জন্যে তাঁকে জমিদারি ও বাড়ি ছাড়া পর্যন্ত হতে হয়েছে। অবশ্য তিনি স্বমহিমায় ফিরে এসে আবার জমিদারির হাল ধরেছেন - এসব কথা গড়গড় বলে চলেছিলেন পীরগাছার অমিত সরকার। অমিত রংপুর জেলা শহরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওর ডাক নাম অলক।

কৃষক-অন্ত প্রাণ দেবী চৌধুরাণী ইংরেজ শাসককুলের দুচোখের বিষ। তাই ১৭৮৭ খ্রিঃ ইংরেজ সেনানায়ক লেফট্‌ন্যান্ট ব্রেনান তাঁকে ডাকাতরাণী আখ্যা দিয়ে রংপুরের কালেক্টরকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এমন রিপোর্টের কথা স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল-এর প্রণেতা হান্টার সাহেব লিপিবদ্ধ করে গেছেন যা দেবী চৌধুরাণীর ঐতিহাসিক চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। লে. ব্রেনান-এর রিপোর্ট ও হান্টার সাহেবের লেখার একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এ.জে.ভাস এর সম্পাদনায় রংপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে। ওদের রিপোর্টে দেবী চৌধুরাণী এক ডাকাত রাণী। কিন্তু দেবী চৌধুরাণী কোনও ভাবে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ভবানী পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা অথবা পরামর্শ নিলেই তো আর ডাকাত রাণী হয়ে যায় না। ইংরেজ শাসকের অত্যাচারে আত্মগোপন করে জলে জঙ্গলে বজরায় বাস করলেই তাকে ডাকাত-রাণী আখ্যা দেওয়াটা নিতান্তই অসামাজিক। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে কোন ডাকাতির বা লুণ্ঠনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেবী চৌধুরাণী চরিত্রের চিত্রায়ন ঘটান নি। বরং বঙ্কিমচন্দ্র দেবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন - ‘‘আমি ডাকাইত নই। আমি কখনও ডাকাইতি করি নাই। কখনও ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি।’’ দেবী চৌধুরাণী যদি ডাকাত হবেন, তাহলে তাঁকে কেনইবা গ্রেপ্তার করেনি ইংরেজ শাসক এ প্রশ্ন তো উঠবেই। ইজারাদার দেবী সিংহের মহিলা লেঠেল বাহিনীর অত্যাচারে তিনি কিছু সময় আত্মগোপন করে থাকলেও বাকি তিন দশক ধরে দেবী চৌধুরাণী মন্থনার জমিদারি সামলেছেন। অথচ ভবানী পাঠকের বিরুদ্ধে সিপাই - অভিযান হয়েছে। লেফট্‌ন্যান্ট ব্রেনানের সিপাইরা গাদা বন্দুকের গুলিতে ভবানী পাঠক ও তাঁর অনুচরদের বজরার মধ্যেই মেরে ফেলেছেন। স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ্‌ বেঙ্গল - রংপুর অধ্যায়ে হান্টার সাহেব এমন সব তথ্য দিয়েছেন।

তবে লেফট্‌ন্যান্ট ব্রেনান একবার দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও রংপুরের কালেক্টর তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করেছেন। বরং দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে আরো খোঁজ খবর নিতে ও তথ্যাদি বিশদভাবে সংগ্রহ করতে ব্রেনানকে নির্দেশ দেন রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেব। আসলে গুডল্যাড সাহেব বুঝে গেছিলেন যে দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করলে রংপুরের প্রজা অসন্তোষ বিদ্রোহের রুপ নেবে এবং সেই রোষ সামলানোর ক্ষমতা সেকালের ইংরেজ শাসকের অন্তত নেই। দেবী চৌধুরাণী ইংরেজ কোম্পানির অত্যাচারী শাসকদলকে কোন প্রকার সাহায্য তো করেনই নি বরং প্রজাদের থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ইংরেজদের সাহায্য না করলেই শুধু

দেবী কেন, সবাই ডাকাত। আসলে প্রজা বিদ্রোহের নেত্রী দেবী চৌধুরাণীকে অর্থ লোলুপ ইংরেজ শাসক ভয় করত। ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্রের সহযোগিতায় তিনিই কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন যখন ইজারাদার দেবী সিংহের লৌকেরা রংপুরের কৃষকদের উপর সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য লুঠতরাজ চালায়। ইংরেজ নিযুক্ত ইজারাদার দেবী সিংহের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন দেবী চৌধুরাণী, পরে যা আন্দোলনের রূপ নেয়। দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে রংপুরের সেই কৃষক বিদ্রোহের কথা ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। দেবী চৌধুরাণীকে রংপুরের মানুষ আজো ভোলে নি। তাঁর জন্য প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার নাপাই চন্ডীর মাঠে মেলা বসে। পনের দিনের নাপাই চন্ডীর মেলায় বহু লোকের সমাগম হয়। সেই ছোটবেলা থেকে এই মেলায় আসছেন সন্তোষ দাস। রংপুর জজ কোর্টের প্রবীন উকিল সন্তোষবাবু দেবীকে চন্ডীরূপে এখনো এখানকার মানুষ পুজো করেন সেকথা মনে করিয়ে দেন।

১৭৬৫ খ্রিঃ ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের বছরে দেবী চৌধুরাণীর জমিদারি শুরু হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেওয়া রাজস্ব নীতি অনুযায়ী বাংলার কৃষকদের থেকে কর আদায় চলতে থাকে। প্রথমে রংপুর জেলার জন্য নির্দিষ্ট করের মাত্রা ছিল ৬ লক্ষ টাকা। মাঝে সূচিত হয় পাঁচসালা বন্দোবস্ত। ১৭৭২-১৭৭৭ খ্রিঃ। পাঁচসালা বন্দোবস্তে ফি-বছর বাংলার অন্য সব জায়গার মতো রংপুরেও কর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে - ৬লক্ষ, ৭ লক্ষ, ৮ লক্ষ, ৯ লক্ষ ও সবশেষে ১০ লক্ষ। রংপুর জেলার জন্য প্রাথমিক ধার্য কর ৬ লক্ষ টাকার জোগান দিতে কৃষক-জমিদারদের অবস্থা তখনই সঙ্গিন। তারপর যখন কর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করলো তখন তাদের সর্বস্ব দিয়ে অভুক্ত থাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। প্রথমে কৃষকরা অর্ধাহার, পরে অভুক্ত অবস্থায় মরতে শুরু করলো। শিশুকে খেতে দিতে না পেরে বাপ-মা দূরে কোথাও চলে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে প্রাণ বিসর্জণ দিল। এমনটা যে হবে তা ইংরেজদের স্থানীয় শাসকদের জানাই ছিল। কৃষকদের কর দিতে না পারার অপারগতার কথা রংপুরের কালেক্টর তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আগেভাগে জানিয়েও কোন ফল হয় নি। এর ফলে রংপুরের জমিদারদেরও খাজনা বাকি পড়তে শুরু করলো। কৃষক কর দিতে না পারলে জমিদারের আর কীই বা করণীয় আছে। এদিকে কর আদায়ের জন্য ইজারাদারির লাইসেন্স-ধারক দেবী সিংহের অত্যাচার চরমে ওঠে। কৃষক ও জমিদারদের উপর যুগপৎ অত্যাচার কৃষক বিদ্রোহের পটভূমি তৈরী করে দেয়। দেবী সিংহের লেঠেল বাহিনী কৃষক ও জমিদারদের উপর লাঠি চালাতো যেমন, তেমনই দেবী সিংহের নিজস্ব মহিলা লেঠেল

বাহিনীও অন্তঃপুরে ঢুকে মহিলা জমিদারদের লাঞ্ছনা ও মারধর শুরু করলে দেবী চৌধুরাণী নাটোরে চলে যান। কেউ কেউ বলেন, তিনি আত্মগোপন করেন। বামনডাঙ্গার জমিদার জগদীশ্বরী দেবী চৌধুরাণী জমিদারি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায়কে কর বকেয়া থাকার কারণে দেবী সিংহের লেঠেল বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখে। বহু টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তবে শিবচন্দ্র রায় দেবী সিংহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। মুক্তি পেয়ে শিবচন্দ্র মন্থনার জমিদার দেবী চৌধুরাণীর পরামর্শে রংপুরের সব জমিদারকে করের বোঝা ও কর আদায়ে দেবী সিংহের অত্যাচারের বিষয়ে ইটাকুমারীতে উপস্থিত হয়ে এক আলোচনা চক্রে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। ইটাকুমারীতে অনুষ্ঠিত সেই জমিদার সম্মেলনে দেবী চৌধুরাণী উপস্থিত জমিদার বর্গের উদ্দেশ্যে প্রায় গর্জে উঠে বলেন - আপনারা কি পুরুষ মানুষ? দেবী সিংহ যা নাই তাই করে যাচ্ছে, আর আপনারা চুপচাপ বসে বসে সেসব দেখছেন। নেহাতই আমি নারী হয়ে জন্মেছি। নইলে অমন দেবী সিংহকে তরোয়ালের এক কোপে কেটে কুচি কুচি করে মাঠে ছড়িয়ে দিতে খুব বেশি সময় আমার লাগতো না। আপনারা পুরুষ মানুষ হয়ে অন্তত কিছু একটা করে দেখান'। দেবীর কথা শুনে সম্মেলনে উপস্থিত জমিদার বর্গের মাথা নীচু হয়ে যায়। দেবী চৌধুরাণীর এমন জ্বালাময়ী ভাষার বক্তব্যে ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায় বাইরে অপেক্ষারত প্রজাবর্গের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করে বলেন, 'তোমাদের ফলানো ফসলে রাজা খায়, পোশাক পরে, ফূর্তি করে। অথচ সেই রাজা দেবী সিংহের অত্যাচারে তোমরা, কৃষকরা আজ অভুক্ত। এক মুঠো ভাতের অভাবে কৃষকের পরিবারে দলে দলে প্রাণ বিসর্জণ দিচ্ছে। মান সম্ভ্রম বজায় রাখা দূরের কথা, পরার কাপড় পর্যন্ত টুকু নেই, যাতে তোমাদের লজ্জা নিবারণ হয়। যে তোমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, পরার পোশাক লুন্ঠন করেছে, তার প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে তোমাদের জীবনভর চরম অপমানের বদলা এখনই নাও। এই আমার আদেশ।' প্রজাবর্গ দেখে ইটাকুমারীর জমিদারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ভগবতী তুল্যা স্বয়ং দেবী চৌধুরাণী। প্রজাদের উদ্দেশ্যে মহীয়সী দেবী, চৌধুরাণী তাদের সামনের পথ চলা ও কর্মের উদ্দেশ্যে হাত তুলে আর্শীবাদ জ্ঞাপন করছেন। দেবী চৌধুরাণীর আশিস্ মাথায় পেতে নিয়ে অভুক্ত, প্রায় উলঙ্গ প্রজারা হাজারে হাজারে হাতের কাছে যার যা ছিল, কাস্তে, লাঠি, দা, কুড়ুল, বল্লম, ছোরা নিয়ে রংপুরের দিকে দৌড় শুরু করে। খবর পেয়ে দেবী সিংহ আগেভাগেই চাদর মুড়ি দিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে পারিষদ-সহ রংপুর ছেড়ে পালায় মুর্শিদাবাদে। কেউ কেউ বলে, দেবী সিংহ ঢাকায় পালিয়ে বেঁচেছিল। আর এদিকে

জনশূন্য দেবী সিংহের প্রাসাদ প্রজাদের দখলে চলে আসে। হাজার হাজার প্রজা দেবী সিংহের প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে ইঁটের স্তূপে পরিণত করে।

প্রজাবিদ্রোহের জেরে দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে ইংরেজ কোম্পানির সরকারকে করের পরিমাণ অনেকটাই কমাতে বাধ্য হতে হয়। দেবী সিংহের হাত থেকে ইংরেজ সরকার ইজারাদারের লাইসেন্স কেড়ে নেয়। আর তার সহযোগী আর এক অত্যাচারী কর আদায়কারী হররাম সেনের এক বছরের জেল এবং এই শাস্তি শেষে হররাম সেনকে চির দিনের জন্য রংপুর ও দিনাজপুর থেকে নির্বাসন দন্ড দেয় ইংরেজ শাসক। ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে এই শাস্তি ঘোষিত হয়নি, কারণ দেবী সিংহকে ওয়ারেন হেস্টিংস বেশ পছন্দ করতেন তার অত্যাচারী ভাবমূর্তির মাধ্যমে কর আদায়ের জন্য। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে, দেবী সিংহকে তার শাস্তি পাঠ করে শোনান। দেবী চৌধুরাণী ও শিবচন্দ্র রায়ের যৌথ নেতৃত্বের রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস এলাকার মানুষ আজো কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

ঋষি বঙ্কিম স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় একশ বছর পরে দেবী চৌধুরাণীর হাল হদিশের খবরাখবর নিতে রংপুরে এসেছিলেন। তখনই দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস লেখার পটভূমিকা তেরী হয়ে যায়। রংপুর - পীরাগাছা - কাউনিয়া - কুরশা ঘুরে ফিলে বঙ্কিম তখন জেনে ফেলেছেন - দেবী শুধু সুন্দরী যুবতী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মেধাবিনী। তাঁর সেই মেধা সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানে কাজে লাগিয়েছিলেন সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক। ইংরেজ শাসককুল ভবানী পাঠককে ডাকাত সর্দার আখ্যা দিয়েছিল। অথচ আজো রংপুর জুড়ে ভবানী পাঠকের নামে স্কাউট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভাবানী পাঠকের কাছে শিক্ষণ-প্রাপ্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিণী দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বের কাছে এঁটে উঠতে পারেনি রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেব এবং সেনাধিনায়ক লেফটন্যান্ট ব্রেনান। ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগসাজস আছে এমন মতলবে ইংরেজ শাসকরা ধরপাকড় শুরু করলে দেবী চৌধুরাণী নিজ জমিদারি ছেড়ে পালান। সেই সুযোগে তাঁর জমিদারি বাতিল ঘোষনা করে ইংরেজ কোম্পানির শাসক প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচার চালায়। ১৭৭১ খ্রিঃ ১৯ অক্টোবর রংপুরের বাতিল হয়ে যাওয়া জমিদারদের নামের তালিকায় জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নাম তালিকাভুক্ত হয়। অবশ্য আবার তিনি জমিদারিতে ফিরে এসে জমিদারি পুনরুদ্ধার করেন এবং সুদীর্ঘকাল জমিদারির কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর জমিদারি আমলে পাওয়া বেশ কয়েকটি পাট্টা থেকে মন্থনার জমিদার হিসাবে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর জমি লেনদেনের ও কেনাবেচার খবর মেলে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির মধ্যে

পীরপাল পাট্টা (১১৭৬ বঙ্গাব্দের ৫ই মাঘ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিঃ) এবং মুশকালি চুকানি পাট্টা (১১৯৭ বঙ্গাব্দের ২৫ কার্তিক অর্থাৎ ১৭৯১ খ্রিঃ) স্থানীয়দের মুখে মুখে ফেরে। পাট্টাগুলি মন্থনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর কথা ও তাঁর জমিদারির সময়কাল পর্যালোচনার উল্লেখযোগ ভূমিকা নেয়। 'দেবী চৌধুরাণী' উপাধি রংপুরের জমিদারির ইতিহাসে প্রায় এগার জনের ছিল। এবং তারা প্রায় সমসাময়িক। আসল দেবী চৌধুরাণীর পরিচয় নিয়ে সমস্যা জটিল করে দিয়ে যান সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভবানী পাঠকের শিষ্যা যে দেবী চৌধুরাণীর নাম ব্যবহার করে ঋষি বঙ্কিম অতি দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে উপন্যাস লিখে গিয়েছেন - তা কারোরই আসল নাম নয়, উপাধি মাত্র। তবে সেই সময়ের ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্র ঘেঁটে বোঝা যায় যে পীরগাছার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীই বঙ্কিমের কালজয়ী উপন্যাসের সেই অসামান্যা নায়িকা।

দেবী চৌধুরাণী ছিলেন মন্থনার জমিদার। মন্থনার তাঁর সেই জমিদার বাড়ি, কাছারি, মন্দির এসব এখনো আছে। রংপুরে মন্থনার জমিদার বাড়ির কেউ সন্ধান দিতে পারে না। আসলে মন্থনা নামে কোন মৌজা বা গাঁ নেই। বিষয়টি সরল করে দিয়ে রংপুর জজ কোর্টর উকিল সন্তোষ বাবু বলেন - কোচ রাজ্যের অধীনস্থ কর্মচারী অনন্তরাম মন্থনা জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন কোচ মহারাজা রূপনারায়ণের সময়। অনন্তরামের আবেদনে কোচ মহারাজ বিভিন্ন জমিদারির অংশবিশেষ কেটে কেটে (মন্থন করে) নতুন জমিদারি তৈরী করে দেন, তাই জমিদারির নাম মন্থনা। মন্থনা জমিদার বাড়ি রংপুরের পীরগাছায়। ইতিহাসের পথ বেয়ে বহু সময় পেরিয়ে আসা দেবী চৌধুরাণীর হাতে গড়া মন্থনার জমিদার বাড়িটিকে পীরগাছা স্টেশন ও পীরগাছা থানা সংলগ্ন এলাকায় ভগ্ন অবস্থায় আজো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মন্থনা জমিদার বাড়ির কাছে এলে দেবী চৌধুরাণীর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভূত হয়। প্রজাদের কাছে দেবী ছিলেন মায়ের মতন। সন্তান স্নেহে তিনি প্রজাদের ভালোবাসতেন, জমিদারি পরিচালনা করতেন। বর্তমান রংপুর জেলার পীরগাছার মানুষ দেবী চৌধুরাণীর সেই সব মহীয়সী গাথা আজো ভোলে নি। মাঝে কত প্রজন্ম চলে গেছে, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু দেবী চৌধুরাণী বেঁচে আছেন মানুষের চেতনায় ও মনে, পীরগাছার অদূরে চৌধুরাণী নামে রেল স্টেশনে, চৌধুরাণী হাইস্কুলে, চৌধুরাণী নামের সড়কে, ডাকঘরে, পল্লী কল্যান কেন্দ্রে ও আরো অজস্র স্থানে। এককথায় কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী দেবী চৌধুরাণীকে কেউ ভোলে নি। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করলে তাকে কেউ ভোলে না, না তাকে ভোলা যায়। দেবী চৌধুরাণী বর্তমান প্রজন্মের কাছেও শুধু কৃষক বিদ্রোহের এক অবিসংবাদিত জননেত্রী অথবা দেবী চন্ডী নন, তিনি ঠিক মায়েরই মতন।